দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 23 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা - ৫ ... কলাম ... ১ ...

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ঃ কিছু কথা

বিচারপতি মোস্তফা কামাল

সরকারী তহবিল থেকে ঢাকায় প্রথম স্থাপিত হয় "ঢাকা সার্ভে স্কুল" ১৮৭৬ সালে। এই প্রতিষ্ঠানটি পুরোনো ঢাকা থেকে কার্জন হল প্রাঙ্গণে ১৯০৬ সালে স্থানান্তরিত করা হয় ঢাকার নবাব স্যার আহসানউল্লাহ'র বিপুল আর্থিক আনুকূল্যে। তখন "ঢাকা সার্ভে স্কুল" নামটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় "আহসানউল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং"। স্কুলটির আয়তন বেড়ে যেতে থাকলে ১৯২০ সালে সেটাকে বর্তমান স্থানে সরিয়ে আনা হয়। এই স্কুলটি ধাপে ধাপে কলেজে পরিণত হয় এবং ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এর নাম দাঁড়ায় "আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ"। ১৯৬২ সালে এই কলেজটি রূপান্তরিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে"। আর্কিটেকচার বা স্থাপত্যবিদ্যা এবং স্নাতকোত্তর মাস্টার্স ডিগ্রী এই সময় থেকেই প্রবর্তন হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় "বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়" এবং পিএইচ.ডি পর্যায়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থাও এই সময় থেকে শুরু হয়।

আমি ঢাকায় ১৯৪৭ সাল থেকে বাস করি। আমার চোখের সামনে একটি বিনীত প্রতিষ্ঠান শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আজ মহামহীরুহের আকার ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্যে অনেক উপাচার্য, অনেক শিক্ষক ও প্রশাসক, অনেক অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মেধা, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে দিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় একটি স্মরণীয় নাম, ডঃ এম.এ রশীদ, প্রথম উপাচার্য, যাঁর অবদান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভালবাসার রঙে রঞ্জিত হয়ে আছে। তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি আজ এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষার অঙ্গনে আজ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে যে অবদান রেখেছে এক কথায় তা তুলনাহীন। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশলী পদগুলি আমাদের কোন বিদেশীদের দ্বারা বা বিদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করতে হয়নি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে যারা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভ করেছেন শুধু তাদের দিয়েই দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর উপর আমরা আমাদের চাহিদা মিটিয়েছি। যে কোন উন্নয়নশীল দেশের জন্যে এটা একটা গর্বের এবং শ্লাঘার বিষয়। শুধু তাই নয়, ডিগ্রী প্রাপ্ত বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাথে উন্নত দেশগুলোর প্রকৌশলগত উন্নয়নে তাদের অবদান রেখেছে। এই একটি ক্ষেত্রে আমরা দাতা দেশের ভূমিকা পালন করেছি, গ্রহীতা দেশের নয়। অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এত বড় গলায় এই জোর দাবী আমরা করতে পারি না। দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাদপীঠ এই মহতী প্রতিষ্ঠানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।

দেশের অন্যান্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত বুয়েটেও মাঝে-মধ্যে শৃঙ্খলার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আমি বিচারপতি পদে আসীন থাকার সময় লক্ষ্য করেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত নিরপেক্ষতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁরা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে তা একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করে ব্যথিত না হয়ে পারি না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী সর্বোচ্চ কৃতিত্বের সাথে অর্জন করার পরেও আমাদের অর্থনীতির মজবুত ভিত্তি গড়ে না ওঠায় আমরা এই কৃতী প্রকৌশলীদের তাদের নিজ নিজ পেশায় সরকারী এবং বেসরকারীভাবে পূর্ণ আত্মীকরণ করতে পারছি না। তাদের অনেককে বেকার জীবন-যাপন করতে দেখে মনে বড় দুঃখ লাগে। অবার তারাই যখন নিজের পেশা ছেড়ে বি.সি.এস (প্রশাসন) বা বি.সি.এস (বৈদেশিক) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং উত্তীর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশায় চলে যান, তখনও মনে কষ্টের সীমা থাকে না। আমি তাদের কি বলব? একজন বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে তাদের কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া এবং আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদেরকে পূর্ণ আত্মীকরণের ক্ষমতা দ্রুত অর্জন করুক, এই দোয়া করা ছাড়া আমার করণীয় কিছু নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব প্রকৌশলী বিভিন্ন প্রকৌশলী সংস্থায় নিয়োজিত আমরা এমনকি তাদের প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। বড় বড় পরিকল্পনায় ও তার বাস্তবায়নে আমাদের নীতি হওয়া উচিত শতকরা ১০০ ভাগ প্রকৌশলী আত্মনির্ভরতা। দুঃখের বিষয় বড় বড় পরিকল্পনায় আমরা এখনও আর্থিকভাবে পরনির্ভর, আংশিকভাবে হলেও। এই পরনির্ভরতার সুবাদে আমাদের উপর বিদেশী প্রকৌশলী চড়া মূল্যে চাপিয়ে দেয়া হয় যাদের উপর ব্যয়িত সব খরচ শেষ পর্যন্ত আমাদেরই বহন করতে হয়। এরা অনেক সময় দেশীয় আবহাওয়া, চাহিদা, মূল্যবোধ, স্থাপত্যরীতি বা পরিবেশ কোনটাই পুরোপুরি বুঝতে পারেন না। অসুস্থ রোগীকে যেমন বাধ্য হয়ে তিক্ত ওষুধ সেবন করতে হয়, আমরা তেমনি এদের উপদেশ ও নির্দেশ আত্মঘাতী হলেও উপায়ান্তরবিহীন হয়ে গলাধঃকরণ করি। আপনাদের সকলের হয়ে আমি এই অসহনীয় অবস্থার আশু অবসান কামনা করি।

স্নাতকোত্তর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমার কয়েকটি বিনীত নিবেদন রাখছি। একটি দেশের প্রবৃদ্ধির হার গণনা করা হয় কিছু সূচক দিয়ে। এই প্রাণহীন গবেষণায় আমার কোন আগ্রহ নেই। সূচক যতই উপরের দিকে থাক না কেন, শিক্ষা এবং শিক্ষিত লোকের মানোন্নতির সূচক একেবারেই অন্য ধরনের নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠিতে বিচার করতে হয়। আমরা কেউ চাই না যে, সন্ত্রাসী ও অতি সংকীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তির সর্বগ্রাসী চাপে দেশের শিক্ষিত মানুষেরা অসহায় বোধ করুন এবং শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার দরুন অপরাধবোধে ভোগেন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, মাস্তান প্রকৃতির মানুষের দাপটে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন প্রবৃদ্ধির সূচক নিয়ে গর্ব বা আনন্দ বোধ করার কোন মনোবৃত্তি থাকে না। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের মধ্যে তেরো কোটি মানুষকে যদি উন্নয়নের স্বাদ দিতে হয় তাহলে এই তেরো কোটি মানুষের ভেতর আদর্শগত, স্বার্থগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভেদ এবং বিভেদগুলি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা প্রয়োজন। এই বহুধা-বিভক্তি সংকুচিত করার চেষ্টা না করে আমরা সবাই যদি পারস্পরিক ঘৃণা, প্রতিহিংসা ও প্রতিপক্ষ বিলোপ করার মত আত্মহননমূলক কাজে নিয়োজিত থাকি তাহলে এই ক্রমাগত অনৈক্য ও বিভেদের সুযোগ নিতে দেশীয় এবং বৈদেশিক স্বার্থান্বেষীরা মোটেই কার্পণ্য করবে না। এক সময় বাংলাদেশের এই অঞ্চলটিতে বিভক্তি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল, যে, দেশটাকে "বারো ভূঁইয়ার দেশ" বলে আখ্যায়িত করা হতো। আমাদের এই ছোট্ট দেশটিতে বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম বিভিন্ন শক্তিমান ভূঁইয়ার আবির্ভাব কঠোর হাতেই দমন করা দরকার। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, যে অঞ্চলগুলি নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত এই অঞ্চলটি অতীতে বহুবার স্বাধীন হয়েছে, আবার বহুবার স্বাধীনতা হারিয়েছে। অনৈক্য এবং বিভক্তিই ছিল এর একমাত্র কারণ। আমরা ইতিহাস থেকে এই অপরিহার্য শিক্ষা প্রতিক্ষণে আমাদের অন্তরে জাগরূক রাখব।

শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষায়, একটা ইতিবাচক প্রভাব মানুষের ব্যক্তিত্বে, মেধায় ও মননে একটি চিরন্তন ছাপ রেখে যায়। ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠে পরিশীলিত, সহিষ্ণু এবং ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মেধা হবে উর্ধ্বগামী এবং নিজ পেশায় সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে নিরন্তর অবহিত। মনন হবে নতুন পথের সঞ্চারী, নতুন দিক-নির্দেশনায় নিয়োজিত। এই রূপান্তরটুকু না ঘটলে স্নাতকোত্তর হবার পরেও স্নাতকহীনদের সাথে কোন বৈষম্য থাকেনা।

আমাদের দেশে নতুন নতুন প্রকৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের এত অজস্র প্রয়োজন ও সুযোগ রয়েছে যে, তার বর্ণনা দেয়া প্রায় অসম্ভব। দেশের অন্য সকলের মতো আমার একান্ত কামনা আমাদের নিজেদের প্রকৌশলীরাই বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করুন ও তার বাস্তবায়ন করুন। অসহনীয় যানজটে যখন নাগরিক জীবনে দীর্ঘস্থায়ী নাভিঃশ্বাস উঠেছে তখন দেশীয় প্রকৌশলীর সাহায্যে রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে আমরা ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো রেলপথ নির্মাণ করতে পারি কিনা, আন্তরিকভাবে সেই চিন্তা আমাদের এখন করতে হবে। শহর, বন্দর, গ্রাম ও জনপদে সন্ত্রাস, অরাজকতা ও আইন-শৃঙ্খলার পূর্ণ প্রস্থান কেবলই একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা নয়। এর একটা প্রকৌশলগত ব্যর্থতাও নিহিত রয়ে গেছে। আমাদের নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে চরম দেউলিয়াপনা, রাস্তা ও গলিতে প্রবেশ ও নির্গমণের পরিকল্পনার অভাব, নগর এবং শহরগুলো ক্রমাগতভাবে বস্তি দিয়ে ভরে তোলা আমাদের পরিকল্পনাহীনতারই কুফল। আমাদের নগর বন্দরগুলো আধা শহর, আধা গ্রাম। কোনরকম যোগ্যতা ছাড়াই ঢাকা নগরী ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য একটি মেগাসিটিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে প্রকৌশলী ধ্যান-ধারণা আমাদের কিছু পথের সন্ধান দিক।

আমি আমাদের সমাজে অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে পরিষ্কার বলতে চাই যে, একটি দেশের প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, তা সে যে বলয়ের রাজনীতিই হোক না কেন, পুলিশ প্রশাসন এবং প্রভাবশালী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই দুষ্টক্ষত কিছুতেই জনজীবনকে রাহুগ্রাসে ফেলতে পারেনা। আমরা নারীর ক্ষমতায়নের পথে সাম্প্রতিককালে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছি; কিন্তু আমাদের মা-বোনেরা শহরে বা গ্রামে এখনও দিনে বা রাতে কোন সময়েই নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেনা। আমাদের আশপাশের কয়েকটি দেশে দেখেছি মেয়েরা গভীর রাতেও একা পথ চলছেন, তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার কোন সাহস কারোর নেই। উন্নয়নের সূচক আছে মানলাম, কিন্তু সভ্যতার সূচক যদি এ-ই হয় যে, কোন মহিলা দেশে কোথাও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন না তাহলে সেই সমাজ ও দেশকে কোন্ সূচকে সভ্য সমাজ বলি? আমাদের ঐতিহাসিক পরশ্রীকাতরতা আজ এমন পর্যায়ে পৌচেছে যে, কোন মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান, নিরাপত্তা এবং মান-মর্যাদা ইতরজনদের চরিত্রহননমূলক অপঘাতী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত নয়। আমাদের রাজনীতি আজ যে স্তরে, মানুষের মান-সম্মানও সেই স্তরেই নেমে এসেছে। একটা প্রচণ্ড দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা আমাদের এই অপরাধজগৎ ও চরিত্রহননের ঘৃণ্য খেলা থেকে মুক্ত করে আনতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। আইন-শৃঙ্খলার রক্ষণ এবং সম্পত্তি, সম্মান ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার রক্ষণ রাষ্ট্রই সাধারণ মানুষকে দিয়ে থাকে এবং এটাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধটি কর্পূরের মতো উবে গেল কিনা আমরা নিজেদের কাছে সবসময় নিজেরা এই প্রশ্ন রাখবো।

প্রকৌশলী সমাজকে তাদের নিজেদের ভাবমূর্তি সম্পর্কে একটা গভীর এবং স্বচ্ছ চিন্তা করতে হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেবার ৬ বছরব্যাপী যে আয়োজন, দেশের সাধারণ মানুষের আয় থেকে এই আয়োজনের সিংহভাগ পূরণ করতে হয়। একটি প্রকৌশলী তৈরী করতে দেশের মানুষকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়। যারা দেশে কাজ করার সুযোগ পান না বা ভিন্ন পেশায় চলে যেতে বাধ্য হন বা বেকার অবস্থায় থাকেন, তাদের কথা আমি আগেই বলেছি; কিন্তু অনেকে আছেন যারা শিক্ষা-জীবন শুরু করার সময় থেকেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাদের আত্মোন্নতির সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। পাস করা মাত্রই বিদেশে পাড়ি এবং দেশকে বিনিময়ে কোন কিছু না দিয়ে বাকী জীবন তারা স্বার্থপরের মতো উন্নত দেশগুলোতেই তাদের পুরো সৃজনশীল সময়টুকু ব্যয় করেন। আবার যারা দেশে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন, সরকারী বা বেসরকারীভাবে, তারা কতটা সততা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ববোধের সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যান, সে প্রশ্ন প্রকৌশলীরা নিজেরাই নিজেদের করুন এবং সমাধান খুঁজে নিন। প্রকৌশলবিদ্যায় সনদপ্রাপ্ত হওয়ার পরও প্রতিদিনে, প্রতিপলে যে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, কতটুকু আন্তরিকতার সাথে সেই অগ্রগতির সাথে প্রকৌশলীরা নিজেদের অবহিত রাখছেন, সে প্রশ্নও তারা নিজেদের করুন। প্রকৌশলবিদ্যা কেবলই একটি আত্মোন্নতিমূলক বৃত্তি বা পেশা নয়। এই বিদ্যার সাথে জনসেবার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। গরীব দেশের মানুষের কষ্টার্জিত আর্থিক আনুকূল্যে প্রকৌশলী হিসেবে বেরিয়ে আসার পর দেশের মাটি ও মানুষের কাছে প্রকৌশলীরা তাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা কতটা শোধ করার চেষ্টা করলেন, এ প্রশ্ন তারা নিজেরাই নিজেদের কাছে রাখুন। ■

আমাদের নীতি হওয়া উচিত শতকরা ১০০ ভাগ প্রকৌশলী আত্মনির্ভরতা। দুঃখের বিষয় বড় বড় পরিকল্পনায় আমরা এখনও আর্থিকভাবে পরনির্ভর, আংশিকভাবে হলেও। এই পরনির্ভরতার সুবাদে আমাদের উপর বিদেশী প্রকৌশলী চড়া মূল্যে চাপিয়ে দেয়া হয় যাদের উপর ব্যয়িত সব খরচ শেষ পর্যন্ত আমাদেরই বহন করতে হয়। এরা অনেক সময় দেশীয় আবহাওয়া, চাহিদা, মূল্যবোধ, স্থাপত্যরীতি বা পরিবেশ কোনটাই পুরোপুরি বুঝতে পারেন না। অসুস্থ রোগীকে যেমন বাধ্য হয়ে তিক্ত ওষুধ সেবন করতে হয়, আমরা তেমনি এদের উপদেশ ও নির্দেশ আত্মঘাতী হলেও উপায়ান্তরবিহীন হয়ে গলাধঃকরণ করি। আপনাদের সকলের হয়ে আমি এই অসহনীয় অবস্থার আশু অবসান কামনা করি।